BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/02100001

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 10| November 2024| e-ISSN: 2584-1890

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের আলোকে মানবিক সংকট সন্ধান

স্বাগতা বিশ্বাস

গবেষক, বাংলা বিভাগ, আর. কে. ডি. এফ. বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত, Mail_Id: Swagatabiswas@gmail.com

সার সংক্ষেপ: *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ছাড়াও ছোটগল্পকার হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পিতৃদত্ত প্রকৃত নাম হলেও তাঁর ছদ্মনাম নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হিসেবেই বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে তিনি সুবিদিত। কঠিন বাস্তবের নিখুঁত বর্ণনা আমাদের রোমকূপে শিহরন তোলে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সেই সময়ের ঘটনার কাঁচ ঝকঝকে শব্দায়ন একজন জাত-কথাসাহিত্যিককেই আমাদের সামনে নিয়ে আসে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেই সময়ের সামাজিক চালচিত্র অক্ষরসংলাপে সময়কে গল্পের পিঞ্জরে বন্দি করেছেন। অসুস্থ সমাজ, অসুস্থ মানুষের ছবি এঁকেছেন বিভিন্ন ছোটগল্পে। সেইরকম কিছু ছোটগল্প হল —'দুঃশাসন', 'ডিম', 'পুস্করা', 'ভাঙা চশমা', 'বীতংশ', 'কালো জল', 'ওস্তাদ', 'মেহারা খাঁ', 'হাড়', 'বস্ত্র', 'নীলা', 'নক্রচরিত', 'ডিনার', 'তীর্থযাত্রা', 'নেতার জন্ম', 'অধিকার' ইত্যাদি। মানুষ শুধু খাবার খেয়ে বাঁচে না, খাবার খেয়ে মরে। অনেকদিনের খাদ্যাভাবে খাবার না পেয়ে হঠাৎ খাবার পেয়ে গেলে শরীরে ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়া শুরু হয়। ডোম পাগলি, হঠাৎ অতিরিক্ত সুস্বাদু খাবার পেয়ে এবং খেয়ে তার শরীরে দেখা দেয় সমস্যা জলের জন্য মাটিতে গড়াগড়ি করছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় জল তেষ্টায় জিভ বার করে মা কালীর মতো হাঁপাচ্ছে এক ফোটা জলের জন্য। 'পুস্করা' গল্পের জীবন সত্য আমাদের বেদনার্দ্র করে । 'দুঃশাসন' শব্দটি বর্তমানে মিথ, মিথ-কল্প চরিত্র। মহাভারতের চরিত্র, তার স্থিতি অবস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও মানব সমাজ আপামর ভারতীয় সভ্যতা দুঃশাসনকে কোনদিন এক মুহূর্তের জন্য ভালো বলবে না। আমাদের ভারতীয় সভ্যতা নারীদের, মেয়েদের, কন্যারত্নকে সবচেয়ে বেশি সম্মান দিয়ে এসেছে সেই চর্যার যুগ থেকে। মাতৃতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমাদের দেশ সমগ্র মানববিশ্বে পরিচিহ্নিত। গল্পকার সমাজের সেই দুঃশাসনদের চিহ্নিত করেছেন তাঁর 'দুঃশাসন' গল্পে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা একটি ছোটগল্প হল—'বস্ত্র'। গল্পের নায়ক নগ্ন ছাদেম ফকির অন্ধকার রাত্রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সে শ্মশানে গিয়েছে মৃতদেহের পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড খুঁজতে। পেয়েও গেছে। কিন্তু সমস্যা হল—এই নতুন বস্ত্র দিয়ে সে তাদের পরিবারের কার কার লজ্জা নিবারণ করতে পারবে ? কারোর শরীরেই তো বস্ত্র নেই। তার নিজের স্ত্রীর, না তার পুত্রবধুর। শেষপর্যন্ত ছাদেম ফকির সেই নতুন বস্ত্রখানি গলায় দিয়েই আত্মহত্যা করে। লাশকাটা ঘরে চালান করার সময় ছাদেম ফকিরের গলা থেকে কাপড় খুলে দু-টুকরো করে কেটে শরীরে জড়িয়ে ছাদেম ফকিরের স্ত্রী আর তার পুত্রবধু মহাসুখে কাঁদতে বসে। কী অদ্ভুত মোচড়ে গল্পকার মানুষের ভেতরের অভিরাগ ব্যঞ্জনা করেন! সত্যিকার জাত-লেখক এরকমই। 'নক্র' শব্দের অর্থ হল 'কুমীর'। অর্থাৎ কুমীর যেমন তার শিকার ধরার জন্য মরার ভান করে পড়ে থাকে, তেমনি 'নক্রচরিত' গল্পের নিশিকান্ত। সে নক্রচরিত্রের অধিকারী। গ্রামের মদনযোগী, বিশাখা, ইব্রাহিম দারোগা, প্রভৃতি চরিত্রগুলি কোন না কোনভাবে তার শিকারে পরিণত হয়েছে। আমাদের সমাজে 'নক্রচরিত' টাইপের চরিত্রের কিন্তু অভাব নেই। 'হাড়' গল্পটির পটভূমি ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ। কৃষিনির্ভর মানুষ গ্রাম ছেড়ে দুর্ভিক্ষের দিনে শহরের দিকে ছুটে গিয়েছিল। তারা ভেবেছিল শহরে অন্তত খাদ্যাভাবে তারা প্রাণে মারা যাবে*

না। যে আশা আর প্রত্যাশা নিয়ে শহরের জৌলুস ছুঁতে গিয়েছিল তা আখেরে পতঙ্গের আগুনপ্রীতি ছাড়া আর কিছু নয়। গল্পের পটভূমি কলকাতা শহর। সমাজের দুই বিপরীত শ্রেণির মানুষের শ্রেণিগত পরিচয় এই গল্পে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজসচেতন, দায়বদ্ধ একজন ছোটগল্পকার। মহামারি, যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগের মতো দৈশিক, রাজনৈতিক, পালাবদল তিনি সরাসরি চোখে দেখেছেন। দেখেছেন খেটে খাওয়া মানুষের অন্তরে তখনও বেঁচে থাকা মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা সহমর্মিতা। আবার কিছু মানুষ আছেন যারা সরলতার সুযোগ নিয়ে চরম ক্ষতি করতে পিছপা হয় না। চোরাকারবার, খাবারে ভেজাল মেশানো, গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে তাদের পণ্যে পরিণত করার মতো অতি নৃশংস ঘটনাও তাঁর গল্পের অবয়ব গঠন করেছে। সহস্র খারাপের মধ্যে পৃথিবীতে এখনো ভাল মানুষ রয়েছেন—তার গল্পে সেই আভাস আমরা পাই।

সূচক শব্দ: *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশ-ভাগ, খাদ্যাভাব, বস্ত্রসংকট, 'দুঃশাসন', 'ডিম', 'পুস্করা', 'ভাঙা মা', 'বীতংশ', 'কালো জল', 'ওস্তাদ', 'মেহারা খাঁ', 'হাড়', 'বস্ত্র', 'নীলা', 'নক্রচরিত', 'ডিনার', 'তীর্থযাত্রা', 'নেতার জন্ম', 'অধিকার' 'শিঙবোঙা', 'করমদেবতা'।*

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯১৮-১৯৭০), প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক ছাড়াও ছোটগল্পকার হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় পিতৃদত্ত প্রকৃত নাম হলেও তাঁর ছদ্মনাম্ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় হিসেবেই বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে তিনি সবচেয়ে সুবিদিত। যেমনটি আমরা দেখেছিলাম কল্লোলিয়ান মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেলায়, আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেটি আড়াল হয়ে গিয়ে ছদ্মনামেই পরিচিতি লাভ করলেন। বলা যেতে পারে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি লড়ে তিনি নিজের পিতৃদত্ত নামটিই খোয়ালেন! নাম খোয়ালেন—কিন্তু 'আচ্ছা হ্যায়'। তাঁর লেখা প্রথম ছোটগল্প 'অতসীমামী' দিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হিসেবে সর্বজন পরিচিত পেলেন। বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যে অনেক অনেক সাহিত্যিক ছদ্মনামের মধ্য দিয়ে নিজেদের কালজয়ী করেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও সেইরকম একজন কথাসাহিত্যিক যিনি আসল নাম নয়— ছদ্মনামেই পরিচিতি পেয়েছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের অন্দরে— সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশ-ভাগ ছাড়াও তাঁর গল্পে দরিদ্রতা, খাদ্যাভাব বিশেষভাবে ছায়া ফেলেছে। গ্রাম বাংলার অসংখ্য ক্ষুদপিপাসু মানুষকে তাঁর গল্পে বিশেষ করে মন্বন্তরের দিনগুলোর গল্পে দেখেছি— একটু ফ্যানের জন্য গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে মানুষ পা বাড়িয়েছে। শহরের নোঙ্গরখানায় ফ্যানের জন্য লাইনে পৌঁছানোর প্রাণান্তকর লড়াই শুরু ভোররাত থেকেই। বিয়ে বাড়ি, ভোজবাড়ির ডাস্টবিনে কুকুরে মানুষে উচ্ছিষ্ট খাবারের ভাগ নিয়ে লড়াই করার মর্মভেদী সংবেদন, সে সময়ের সাহিত্যিক উপন্যাসিকেরা তুলে ধরেছেন। তাঁদের মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও আছেন। কঠিন বাস্তবের এত নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আমাদের রোমকূপে শিহরন তোলে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সেই সময়ের কাঁচ ঝকঝকে ঘটনার শব্দায়ন সঙ্গে নিরমম বিবরণ একজন জাত-কথাসাহিত্যিককেই আমাদের সামনে টেনে নিয়ে আসে।

"১৯৪৩ ও ১৯৪৪— বছর দুটি যেন মানুষের জীবনে দুঃসহ অভিজ্ঞতার ঝাঁপি উপুড় করে দিয়েছে। আকাল মহামারি অবক্ষয় মৃত্যু— এই বুঝি তার বিধিলিপি। সর্বাত্মক ধ্বংসের কিনারায় এসে পৌঁছেছে গোটা দেশ ও সমাজ— তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। চেতনার স্পন্দনটুকুও কোথাও আর অবশিষ্ট নেই।

নৈরাশ্যের আঁধার কবি মঙ্গলাচরণকেও যেন গ্রাস করেছে। তিনি পালিয়ে যেতে চান দেশ সমাজ ও আত্মজনের কাছ থেকে দূরে— বহুদূরে। তিনি লিখেছেন:

অনেকদিন অনেক দূর রেললাইন ধরেই জীবন থেকে পালাই।

উনিশশো তেতাল্লিশ ... উনিশশো চুয়াল্লিশ ... শহর থেকে শহর।

বাংলাদেশে হারিয়ে যাই, বাংলাদেশ ছাড়াই। পথের শেষে খবর:

পিছন থেকে নরক তার হাত বাড়ায়— মরক, রুগ্নদেহ বালাই ;

সামনে মন টলছে, ঘোর কুয়াশা দিকসীমায়, সন্ধ্যা গোনে প্রহর।''[১]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঠিক এই রকম সময়কেই অবলোকন করেছেন-- দেশের খাদ্য সংকট ও বস্ত্র সংকটের নাঙ্গা বীভৎসতা। অনাহার, দারিদ্র্য বস্ত্র সংকটের চালচিত্র সেই সময়ের কবিদের কলমেও উঠে এসেছে। নাগরিক কবি সমর সেনের কবিতায় দুর্ভিক্ষের পটভূমি উঠে এসেছে 'ক্রান্তি' নামের কবিতায়— ''আজ তাম্রসীতা, উলঙ্গিনী দুর্ভিক্ষকন্যা আমাদের দেশ/লঙরের সামনে অস্থি চর্মসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে বসে।'' রাতের অন্ধকারই মা মেয়ের ইজ্জৎ-লজ্জা বাঁচানোর একমাত্র উপায় হয়ে আছে। কবিদের কলমের শানিত ধার বার বার বিদ্ধ করেছে শাসক সম্প্রদায়কে।অসহায় সময়ের নিগড়ে পড়ে সাধারণ মানুষ যন্ত্রণায় ছটপট করছে। কথাশিল্পী তাদের হৃদয়ের সবটুকু অনুভূতি উজাড় করে সেই সময়কে সেলাই করেছেন শব্দে শব্দে— ''রাঘব উঠে দাঁড়িয়ে হুমড়ি খেয়ে গৌতমের পায়ে, দুহাতে দু'পা চেপে ধরে বসে, আজ চলাচলি নাই বাবুঠাকুর; কাপড়গুলো মোদের দিয়ে তুমি যাও গো। দানছত্তর করে যাও বাবুঠাকুর। মোদের ঘরে মেয়েগুলো ন্যাংটো হয়ে আছে গো। মেয়েগুলো ন্যাংটো বাবুঠাকুর। মা-বুনু ন্যাংটো, মেয়ে-বউ ন্যাংটো—'' (আজকাল পরশুর গল্প/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়/ রাঘব মালাকার/পৃ-৪৪১ বস্ত্র সংকটের অভাবনীয় চিত্র আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে পাই। মানবিকতার তলানিবিন্দুতে পৌঁছে যাওয়া মানুষ কিড়ে-মকড়ার মত দিনাতিপাত করছে। তাদের একে অপরে অন্ধকারের আরাল নিয়ে কথা বলে— ছায়া ছায়ার সঙ্গে কথা বলে। বাইরে বেরোনোর মতো পরিধেয় পোশাক পর্যন্ত নেই। এই অসহায় সময়ের কথা আমরা কথাসাহিত্যিকের লেখনি থেকে অবগত হই। কোথাও কোন সুচিন্তিত আলোর দিশা নেই। মানুষ মানুষকে পণ্য করে, মানুষ মানুষকে নগণ্য প্রতিপন্ন করার জন্য একশ্রেণির মানুষ হৃদয়ের সবটুকু অসুরশক্তিকে ব্যবহার করে ফেলছে। সুর নয় অসুরের পুজো করছে। বস্ত্র নিয়ে মুনাফাবাজদের চক্রান্ত, আব্রুরক্ষার একমাত্র অবলম্বন ঘরের অন্ধকার, পুকুরের জল, দরজা বন্ধ করে মা-মেয়ে পিতা পুত্র—মানবিকতার চরমতম দিনগুলো আমাদের বাংলাদেশ দেখেছে। একটি পরিবারে সর্বসাকুল্যে একটিই মাত্র বস্ত্রখণ্ড। বাইরে বেরোনো দুর-অস্ত, ঘরের মধ্যে পরে থাকার মতো পোশাক নেই। ঘরের কর্তাপুরুষ যে বাইরে বেরোবে কাজ-কর্ম করবে তারও উপায় নেই। কর্মহীন, কাজে যোগ দিতে না পারলে তো সেই দেশে মহামারি, অন্নাভাব, খাদ্যাভাব আসতে তো বাধ্য। এইভাবেই সেদিনের পরিবেশ তৈরি করেছিল—যার ফলশ্রুতিতে দেশের মধ্যে খাদ্যাভাব আকাল আরও ত্বরান্বিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

বস্ত্র সংকটের দিনে মা, সোমত্ত মেয়ে, বোনেরা পুকুরের জলে গলা ডুবিয়ে বসে আছে আব্রু বাঁচাতে। কী অসহণীয় সময়ের লজ্জার সাক্ষী থেকেছে আমাদের এই বাংলাদেশ। অবর্ণনীয়, হৃদয় বিদারক। কী অসহ্য দিন বেআব্রু সময় বয়ে গেছে বাংলাদেশের বুকের ওপর দিয়ে। সামাজিক, অর্থনৈতিক অবক্ষয় এবং বস্ত্র,খাদ্যাভাবের দিনগুলিতে কিছু কারবারী, ব্যবসাদার, অসৎ চোরা চালানকারী মানুষের পোয়াবারো হয়েছিল। ফুলে ফেঁপে উঠেছিল তাদের লোভরিপুর রোজভ্যালি। তাদের দৃষ্টিতে পণ্য সব কিছু— মা-মাটি-মেয়ে সব পণ্য। সব কেড়ে নাও, কিনে নাও, ঘরের সোনার পুত্তলিকা কন্যারত্নের দিকে তাদের দৃষ্টি পড়েছে। ছলে বলে কৌশলে অসহায়তার চরম লাঞ্ছনদিনে সেই অসৎ সুদজীবীদের খপ্পরে পড়তে হয়েছে—গ্রাম বাংলার অসহায় মানুষদের। তখন এই সব মানুষের কাছে—প্রাণ বাঁচানোটাই জীবনের একমাত্র মোক্ষ। বেঁচে থাকলে তবে ইজ্জত আব্রু! এই সুযোগ সেই সময়ের অসদ-জীবীর পক্ষে স্বর্গোদ্যান হয়ে উঠেছিল। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেই সময়ের সামাজিক চালচিত্র অক্ষরসংলাপে সময়কে গল্পের পিঞ্জরে বন্দি করেছেন। অসুস্থ সমাজ, অসুস্থ মানুষের ছবি এঁকেছেন বিভিন্ন ছোটগল্পে। সেইরকম কিছু ছোটগল্প হল —'দুঃশাসন', 'ডিম', 'পুস্করা', 'ভাঙা চশমা', 'বীতংশ', 'কালো জল', 'ওস্তাদ', 'মেহারা খাঁ', 'হাড়', 'বস্ত্র', 'নীলা', 'নক্রুচরিত', 'ডিনার', 'তীর্থযাত্রা', 'নেতার জন্ম', 'অধিকার' ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসনীয়' গল্পের কথা পাঠকের মনে

পড়বে—"ভূতি দিশেহারা হয়ে ভাবে, 'যাব? ছেলে মাকে ন্যাংটো দেখলে কি আসে যায়? মা কালীও তো ন্যাংটো। ও মা কালী, তুই-ই বল মা, যাব? বল মা, মোর হিদয়ে থেকে একটা কিছু বল!"[২]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দুঃশাসন' গল্পে দেখানো হয়েছে বস্ত্র সংকটের ভয়াবহ তীব্রতা। এই গল্পের নায়ক খল চরিত্র, দেবীদাস, সে কাপড়ের গুদামের মালিক, বড়ো ব্যবসায়ী। সে পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিতে বাধ্য হয়েছে একটি যাত্রা পালা দেখার জন্য, সেই 'যাত্রাপালার নাম 'দুঃশাসনের রক্তপান', কু-সময়ের সঙ্গে যাত্রাপালার নামের অপূর্ব সাযুজ্য গল্পকারের শ্রেস্থত্ব মনে করায় । সকালবেলা যাত্রা পালা দেখে বাড়ি ফেরার পথে লক্ষণ মুচির বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় সে যা দৃশ্য দেখল— তা সে জন্ম জন্মান্তর ধরে মনে রাখবে। ঘাটের পথে এক পলকের জন্য চোখ ফেলতেই তার চোখে পড়ল একটি সম্পূর্ণ নগ্ন ষোড়শী মেয়ে। তার শরীরে কোথাও একটুকরো বস্ত্র নেই। মহাভারতের 'দুঃশাসন' দ্রোপদীর বস্ত্রহরণ করে সেদিন ভরা রাজসভায় নিজের গরিমা হয়তো বৃদ্ধি করতে পেরেছিল, কিন্তু সমগ্র মহাভারতের 'দুঃশাসন' এই একটি কাজের জন্য তার নাম চিরকালের জন্য অনুচ্চার্য ধিক্কারের সারণিতে থেকে গেল। কেউ মুখে উচ্চারণ করেননি। সেই দুঃশাসনের কৃতকর্মের ফলাফল যেন দেখলেন— আমাদের এই গল্পের আপাত খলনায়ক দেবীদাস। গল্পকার বুঝিয়ে দিয়েছেন সমাজের এই দেবীদাসের মতো খল দুঃশাসনের জন্য আজ আমাদের সমাজের এই ষোড়শবর্ষীয়া কন্যারত্নের শরীরে বস্ত্র থাকে না। আসলে তারাই তাদের সন্তানসম কন্যাসম মেয়ের বস্ত্রহারক। দুঃশাসন তো একটা পুরোনো মিথ, মিথ-কল্প চরিত্র। মহাভারতের চরিত্র, তার স্থিতি অবস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও মানব সমাজ আপামর ভারতীয় সভ্যতা দুঃশাসনকে কোনদিন এক মুহূর্তের জন্য ভালো বলবে না। তার কপালে চিরকালের জন্য নারীঘাতী, নারী বিবস্ত্রাকারী একজন পুরুষ হিসেবে মুখে ঝাঁটা ছুড়ে মারবে। আমাদের ভারতীয় সভ্যতা নারীদের, মেয়েদের, কন্যারত্নকে সবচেয়ে বেশি সম্মান দিয়ে এসেছে সেই চর্যার যুগ থেকে। মাতৃতান্ত্রিক দেশ হিসেবে আমাদের দেশ সমগ্র মানববিশ্বে পরিচিহ্নিত। কিন্তু মুনাফালোভী কিছু অর্থবান শেঠদের সৃজিত কৃত্রিম বস্ত্রসংকট-- বাংলাদেশের ইজ্জত আব্রু মেয়ে মায়েদের অসম্মান করবে তা সব সময় চলতে পারে না। গল্পকার সমাজের সেই দুঃশাসনদের চিহ্নিত করেছেন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পুস্করা' ছোটগল্পের মূল বিষয়—'মরক'। ('পুস্করা' বাংলাদেশের রংপুর জেলার একটি আঞ্চলিক শব্দ।এর অর্থ— এক প্রকার মহামারি, অপমৃত্যু। পুস্করা ধরলে গ্রামকে গ্রাম সাফ হয়ে যায়)।--(বাংলা একাডেমি বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান, দ্বিতীয়খণ্ড (ট—ব), প্রথম প্রকাশ: অগ্রহায়ণ ১৪২০ (নভেম্বর ২০১৩)। গ্রামের মানুষ দুর্ভিক্ষের কারণে প্রথমে অর্ধাহারে, অনাহারে এবং শেষপর্যন্ত অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলেছে কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব। মাছিবাহিত জীবানুঘটিত এই রোগজীবানু খেতে না পাওয়া মানুষের আন্টিবডিহীন শরীরে দাবানল ব্যাত্য-ঝঞ্ঝার স্পর্শে অতিদ্রুত বাংলাদেশে কলেরা রোগ মহামারির আকার ধারণ করে। এই গল্পের খল নায়ক তথা গ্রামের জমিদার বলাই ঘোষ তিনশো টাকা খরচ করে শ্মশানকালির পুজোর আয়োজন করেছে। উদ্দেশ্য গ্রামের মরক দূরীভূত হবে। শ্মশানকালিকে মহাভোগ নিবেদন করেছেন। কিন্তু গল্পের ক্লাইম্যাক্সে দেখা দিচ্ছে ডোমপাড়ার বুভুক্ষু পাগলি, কালোরাত্রির অন্ধকারে শ্মশানকালির মন্দিরে পুজোর খাদ্য-ভোগ যা মাকালিকে উদ্দেশ্য করে দেওয়া হয়েছে—সেই ভোগ গোগ্রাসে খাচ্ছে। ডোম পাড়ার এই পাগলি, একেবারে মা কালির প্রতিভূ হয়ে উঠেছে। সেও প্রায় মা কালির মতোই নাঙ্গা, বীভৎস দর্শন, নরমুণ্ড মালা পরিহিতা, কঙ্কালসার। রাতের বেলায় মা কালিকে নিবেদিত ভোগ যেন মা কালিই খেতে এসেছেন। দেশ জুড়ে বুভুক্ষু কঙ্কালসার মা কালির রূপকে গল্পকার একটা সময়ের নান্দীপাঠ করেছেন। মা কালির উদ্দেশ্যে নিবেদিত ভোগ খাচ্ছে, বুভুক্ষু ডোম, পাগলি— গোগ্রাসে খাবার খাচ্ছে না আক্ষরিক অর্থে গিলছে। কারণ এই পাগলির পেটে ক্ষুধার আগুন জ্বলছে, সে বুভুক্ষু। মা কালির নামে উৎসর্গিত খাবার-ভোগপ্রসাদ মৃত্তিকাগঠিত মা কালি খেতে পারেন না, আসলে সে ভোগ খেয়ে গেলেন— ডোমপাড়ার পাগলি।অভূতপূর্ব পাগলিরূপী মা কালির খাবার দৃশ্য দূর থেকে দেখেছেন— সেই মা কালির মন্দিরের পুজোর পুরোহিত তর্করত্ন। ডোমপাড়ার পাগলি অনেকদিন খাবার পায়নি, খাবার খায়নি— অনন্ত ক্ষুধা তার জঠরে। আজকে এই অনাকাঙ্ক্ষিত খাবার পেয়ে, প্রাণ ভরে গোগ্রাসে খেয়ে তার ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছে। এবার তার পিপাসা পেয়েছে। বাড়ি ফেরার পথে তর্করত্ন দূর থেকে দেখে সেই ডোম পাড়ার পাগলি এবার

অতিরিক্ত খাবার খেয়ে সে যন্ত্রণায় ছট পট করছে। মানুষ শুধু খাবার খেয়ে বাঁচে না, খাবার খেয়ে মরে। অনেকদিনের খাদ্যাভাব খাবার না পেয়ে হঠাৎ খাবার পেয়ে গেলে শরীরে ব্যতিক্রমী প্রক্রিয়া শুরু হয়। ডোম পাগলি, হঠাৎ অতিরিক্ত সুস্বাদু খাবার পেয়ে এবং খেয়ে তার শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। জলের জন্য মাটিতে গড়াগড়ি করছে। মৃতপ্রায়। মৃত্যু যন্ত্রণায় জলাভাবে জিভ বার করে মা-- "কালীর মতো হাঁপাচ্ছে এক ফোটা জলের জন্য। দীর্ঘদিনের বুভুক্ষার পরে দেবভোগ্য শিবাভোগ সে সহ্য করতে পারে নি। কিন্তু তবুও পুস্করা কেটে যাবে। মারি আর মড়কের সমস্ত বিষ চিরকাল ওরাই নীলকণ্ঠের মতো নিঃশেষে পান করে নেয়।"[৩]

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ডিম' এই গল্পটির সঙ্গে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্যানিক' গল্পের ছায়াকিরণসম্পাত কিছুটা আছে বলেই আমার মনে হয়। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত একটি সময়ের রেখাচিত্র এই গল্পে রয়েছে। গ্রামের একটি নদীর ওপর বসেছে মিলিটারি ক্যাম্প, এই ক্যাম্পে মিলিটারিদের ডিম জোগান দেওয়ার কনট্রাকটর ছিলেন গ্রামের কনট্রাকটর প্যারিলাল। এই প্যারিলাল গ্রামের মানুষদের নানা রকম ভয়, জবর্দস্তি, প্রলোভন দেখিয়ে সৈনিকদের জন্য ডিম সংগ্রহ করত। এদিকে গ্রামের মানুষদের অপুষ্টি খাদ্যাভাব, অসুখ বিসুখ, ম্যালেরিয়া, জ্বর, রোগভোগ লেগেই আছে। এগুলো সবই অপুষ্টিজনিত খাদ্যাভাবের কারণ। তবু মৃত্যুকীর্ণ মানুষদের একটি ডিম খাওয়ার হুকুম নেই। গল্পের ঘনত্ব বেড়েছে— রজনী নামের এক বৃদ্ধের নাতির ডিম খাওয়ার বাসনার উদ্রেকে। সে একটা ডিম খেতে চায়। কিন্তু রজনী সেই ডিম প্যারীলালকে দিলে নগদ দশ আনা কমিশন পাবে, আর তার জন্য সে ডিম তার নাতিকে খেতে দিতে চায় না। সেই দশ আনা অর্থ মানে তাদের পরিবারের সকলের জন্য একদিনের এক বেলার পরিপূর্ণ খাবারের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা। রুগ্ন শিশুটি তবুও ডিম খাওয়ার জন্য মহা জেদ ধরে বসে। আর এই অবস্থায় রজনীও নাছোড়। কোনোভাবেই পরিবারের একদিনের খাবারের বন্দোবস্ত সে হাতছাড়া করতে চায় না। নাতির জোর জুলুমে বাধ্য হয়ে রজনী নাতির গলা টিপে ধরে। নাতির চোখ চক্ষু-সকেট থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম হলে রজনীর পুত্রবধু শ্বশুরের মাথায় শাবল দিয়ে আঘাত করে এবং আকস্মিক আঘাতে শ্বশুর মহাশয়ের মৃত্যু ঘটে। সামান্য একটা ডিমের জন্য একটা প্রাণ চলে যায়। যুদ্ধ একটা সময়কে কীভাবে শাসন করেছে, বিশেষ করে ইংরেজদের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর কী দূরাবস্থা ঘটেছিল তা আমরা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ডিম' গল্পের মধ্যে দিয়ে কিছুটা হলেও আন্দাজ করতে পারি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম একটি ছোটগল্প হল—'বস্ত্র'। নগ্ন ছাদেম ফকির অন্ধকার রাত্রে বস্ত্রাভাবে ছাদেম ফকির নগ্নভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। নাদেম ফকির অবশ্য শ্মশানে গিয়েছে মৃতদেহের পরিত্যক্ত বস্ত্রখণ্ড খুঁজতে। যদি সে পেয়ে যায়—বালিশের খোল, চটের টুকরো। ঘটনা পরম্পরায় ছাদেম ফকির একদিন একটি নতুন বস্ত্র পেয়ে যায়। কিন্তু সমস্যা হল—এই নতুন বস্ত্র দিয়ে সে তাদের পরিবারের কার কার আব্রু রক্ষা করতে পারবে? কারোর শরীরেই তো বস্ত্র নেই। তার নিজের স্ত্রীর, না তার পুত্রবধুর। শেষপর্যন্ত ছাদেম ফকির সেই নতুন বস্ত্রখানি গলায় দিয়েই আত্মহত্যা করে। লাশকাটা ঘরে চালান করার সময় ছাদেম ফকিরের গলা থেকে কাপড় খুলে দু-টুকরো করে কেটে শরীরে জড়িয়ে ছাদেম ফকিরের স্ত্রী আর তার পুত্রবধু মহাসুখে কাঁদতে বসে। বস্ত্র সংকট এমন ছিল যে স্বামী মারা গেলেও প্রকাশ্যে এসে কান্না করে দুঃখের ভার একটু কমাবে তারও উপায় নেই। গল্পকার কী নিদারুণ সময়ের খাণ্ডবদহন জ্বালার উত্তাপ দিয়ে পাঠকের চেতনাকে উদ্দীপিত করেছেন। সত্যিকার জাত-লেখকের লেখার গুণ এরকমই। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেই জাতীয় গল্পকার। একজনের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে বস্ত্রখণ্ডের সমানুপাতিক ভাগ বাঁটোয়ারার হিসেব মিলে যায়। বস্ত্র সংকটের দিনে জীবনের দামের চেয়ে বস্ত্রখণ্ডের মূল্য কত বেশি— তিনটি জীবনের মধ্যে একটি না কমলে একটি বস্ত্র ভাগ করে দুজনে না হলে তো পরা যায় না। গল্পকার একটি মৃত্যু সংঘটিত করে দিয়ে আপাতভাবে গল্পের সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছেন। পাশাপাশি একটি মহৎ মুশকিলের আসান ঘটেছে। সুস্থ বিবেকবান পাঠকের সামনে এক কঠিন মর্মান্তিক প্রশ্ন এসে উত্তর প্রত্যাশা করে। এর উত্তর সম্ভবত কোন গল্পপাঠকের কাছে নেই।

'নক্রচরিত' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা একটি প্রতিনিধিস্থানীয় এবং পরিচিত গল্প । এই গল্পটির নামকরণের মধ্যে নতুন একটা ব্যঞ্জনা পাঠকের মনে দাগ ফেলে যায়। 'নক্র' শব্দের অর্থ হল 'কুমীর'। অর্থাৎ কুমীর যেমন তার শিকার ধরার জন্য মরার ভান করে পড়ে থাকে, তেমনি এই গল্পের নিশিকান্ত। সে নক্রচরিত্রের অধিকারী, কুমীরবৈশিষ্ট্যের অধিকারী। গ্রামের মদনযোগী, বিশাখা, ইব্রাহিম দারোগা, প্রভৃতি চরিত্রগুলি কোন না কোনভাবে তার শিকারে পরিণত হয়েছে। 'কুম্ভীরাশ্রু' কথাটা আমরা জানলেও কুমীর যে শিকার ধরার সময় মৃত, নিশ্চলতার ভান করে তা এই গল্পে পরিস্কার হয়েছে। আমাদের সমাজে এই 'নক্রচরিত' টাইপের চরিত্রের কিন্তু অভাব নেই। 'হাড়' গল্পটির পটভূমি ১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষ। কৃষিনির্ভর মানুষ গ্রাম ছেড়ে দুর্ভিক্ষের দিনে শহরের দিকে ছুটে গিয়েছিল। তারা ভেবেছিল শহরে অন্তত খাদ্যাভাবে তারা প্রাণে মারা যাবে না। কিছু না কিছু একটা খাবার দাবারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু সেই চিত্রটা বদলে গিয়েছিল। যে আশা আর প্রত্যাশা নিয়ে শহরের জৌলুস ছুঁতে গিয়েছিল তা আখেরে পতঙ্গের আগুনপ্রীতি ছাড়া আর কিছু নয়। এই 'হাড়' গল্পের পটভূমি কলকাতা শহর। সমাজের দুই বিপরীত শ্রেণির মানুষের শ্রেণিগত পরিচয় এই গল্পে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। গল্পের একদিকে আছে বিত্তবান ধনী রায়বাহাদুর H. L. Chatterjee'-র বিলাসবহুল আবাসস্থল। অন্যদিকে মনোহর পুকুর পার্ক, দুর্গন্ধ আবর্জনার গন্ধমাদন পাহাড়। চীৎকার, চেঁচামেচি, হাইড্রান্ট খুলে কুষ্ঠরোগীর মতো কালো নোংরা জল ঝুঁকে পান করার সূক্ষাতিসূক্ষ গল্পকার দর্শন। নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের কথা আমাদের মনে পড়বে। একদিকে আভিজাত্যগর্বিত পরম সুখাবেশে দিন কাটিয়ে দেওয়া H. L. Chatterjee বা D. J. Ammani -র মতো মানুষদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যা, বড়ো বেমানান লাগে—আস্তাকুড়ে ডাস্টবিনে মানুষ আর কুকুরের সঙ্গে খাদ্যাখাদ্যের একযোগ লড়াইয়ে। গল্পকার অত্যন্ত নির্মমভাবে সমাজের মধ্যে বয়ে চলা এই দ্বিবিধশ্রেণির অবস্থানকে নির্দয়ভাবেই শৈল্পিক সার্থকতায় এঁকেছেন। 'হাড়' নামকরণের মধ্য দিয়ে রায় বাহাদুরের কাছে নেশার মত হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হুলাহুলা নাচ, ফিলিপাইন্সের জাদুবিদ্যা, আর রোডেশিয়ানের অর্ধ মানুষ আর অর্ধেক গরিলা প্রজাতির হাড় সংগ্রহ, তাহিতির দ্বীপে কুমারী মেয়েদের হাড়ের গল্প বেমানান হলেও দুর্ভিক্ষের দিনে এইসব গল্পের উপস্থাপনা গল্পকে মোহাবিষ্ট করে সন্দেহ্ নেই।

'বীতংস' ছোটগল্পে ভণ্ড সাধু সুন্দরলাল সরল সাধাসিধে আদিবাসী সাঁওতালদের কাছে গিয়ে তাদের বিশ্বাস অর্জন করে, কালক্রমে তাদের সর্বাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে। মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্যগ্রন্থে আমরা 'বীতংস' শব্দটির দেখা পাই। মাইকেল দেখাতে চেয়েছেন সিংহকে ফাঁদ পেতে ধরা শিকারীর একটা কৌশল। কিন্তু সিংহের মত পশুরাজকে বন্দি করা সব সময় খুব সহজ ব্যাপার হয়ে ওঠে না। এখানে রাবণপুত্র মেঘনাদ সম্পর্কে রাম লক্ষ্মণের সৃজিত 'বীতংস' প্রসঙ্গ এসেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের নাম 'বীতংস' বা ফাঁদ আসলে সমাজের মধ্যে একটি শ্রেণি বিশেষ করে দুর্বলতর শ্রেণিকে গিলে ফেলার ফাঁদ পাতার ব্যাপারটি অত্যন্ত বাস্তবোচিত রঙে গল্পকার এঁকেছেন। এই গল্পে সুন্দরলাল প্রথমে সাঁওতালদের কাছে গিয়ে তাদের সুখে দুঃখে কাছে থেকে একটু-আধটু সাহায্য করে তাদের কাছে বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এটা যে সুন্দরলালের একটা ফাঁদ তা সরলমনা সাঁওতালরা তখন বুঝতে পারেনি। সুন্দরলাল সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধারণ করেছিল। 'শিঙবোঙা', 'করমদেবতা'-র ওপর তাদের ছিল অগাধ অন্ধ বিশ্বাস। তারা সুন্দরলালের কথায় এতটাই বিশ্বস্ত ছিল যে আসামের চা বাগানে কুলির কাজে নামানোর জন্য সুন্দললালের প্রয়াসও সাঁওতালদের ভালো লাগে। সুন্দর যে নির্দেশ দেয়—তা তাদের কাছে দৈববাণীর মতো মনে হয়, 'শিঙবোঙা'-র নির্দেশ বলে মনে হয়। এমনকী পাহাড় থেকে হরিণের পাল এসে তাদের সব খাবার গম শস্যভূমি খেয়ে ফেললেও তারা এর প্রতিকারের জন্য সুন্দরলালের কাছে আসে। তারা তার বিধানের জন্য, নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করে। বড়কা সাঁওতাল এক সাঁওতাল কুমারী মেয়ের মাথায় সিদুর লেপে দিলে তার আর বিয়ে হয় না, কারও পায়ের ঘা তিনমাসের বেশিদিন ধরে শুকোচ্ছে না—নিশ্চয়ই কেউ তার অনিষ্ট করতে চাইছে— সুন্দরলালের কাছে তারা ছুটে এলে তার ওপর শিঙবোঙা ভর করেছে এরকম ছদ্মভাব দেখিয়ে তাদের নিজের প্রয়োজন মতো ব্যবহার করে। তাদের আসামের চা বাগানের শ্রমিকে পরিণত করে। বুধনীকে তার প্রলোভনের শিকার হতে হয়। সাঁওতাল সমাজে যে ঐশী বিশ্বাস আর সংস্কার ছিল সেই বিশ্বাস আর

সংস্কারকে কাজে লাগিয়ে সুন্দরলাল ভারি সুন্দরভাবে নিজের অভীষ্ট সিদ্ধ করেছেন। গল্পের নামকরণে 'বীতংস', ফাঁদ একেবারে মানানসই হয়ে উঠেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমাজসচেতন, দায়বদ্ধ একজন ছোটগল্পকার। মহামারি, যুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগের মতো দৈশিক, রাজনৈতিক, পালাবদল তিনি সরাসরি চোখে দেখেছেন। দেখেছেন খেটে খাওয়া মানুষের অন্তরে তখনও বেঁচে থাকা মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসা সহমর্মিতা। আবার কিছু মানুষ আছেন যারা সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে চরম ক্ষতি করতে পিছপা হয় না। চোরাকারবার, খাবারে ভেজাল মেশানো, গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের ভালোবাসার ফাঁদে ফেলে তাদের পণ্যে পরিণত করার মতো অতি নৃশংস ঘটনাও যে এই সময়ের মানুষ করছে তা তার গল্পের দু'একটি বাতায়ন খোলা হাওয়া চলাচলপ্রক্ষেত্র খুললেই বোঝা যায়। পৃথিবীতে এখনো ভাল মানুষ রয়েছেন—তার গল্পে সেই আভাসও আমরা পাই। সব মিলিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগন্ধর ছোটগল্পকার— যিনি গোটা বাংলাদেশের ভূগোলকে, মানুষকে, সমাজকে তার সাহিত্যে তুলে এনেছেন। কল্পিত কাহিনির সঙ্গে রূঢ় বাস্তবের মেলবন্ধনে মানুষকে সচেতন করে দিয়েছেন, চোখের সামনে আয়না তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। অমলেন্দু সেনগুপ্ত, 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব', প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ১৯৫৭, পার্ল পাবলিশার্স, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ-১১ (https://archive.org/details/in.ernet.dIi.2015.303294)

২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'উত্তরকালের গল্পসংগ্রহ', ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি., ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, ত্রয়োদশ মুদ্রণ: মার্চ ২০০৪, পৃ- ৬৭

৩। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, 'পুস্করা', (kobita.mohool.in) https: //kobita.mohool.in)

Citation: **বিশ্বাস. স্বা.**, (2024) "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের আলোকে মানবিক সংকট সন্ধান", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-10, November-2024.